মহারাণী স্বর্ণময়ী।

অর্থাৎ

মুরশীদাবাদ-কাশীমবাজারের

স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবনী।

বিদ্যাসাগর, শকুন্তলা-রহস্য, ইংরেজের জয়, তিতুমীর,

ভরতপুর যুদ্ধ, গান প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা

শ্রীবিহারিলাল সরকার

বিরচিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

ভূমিকা।

পুণ্যময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ীর লোকান্তর হইলে, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গবাসীতে ও জন্মভূমিতে সংক্ষেপে মহারাণীর গুণ-গাথা ও জীবনকথা লিখিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি। "জন্মভূমি"তে মহারাণীর চরিত-বিশ্লেষণ একটু বিশিষ্ট হইয়াছিল।

পুণ্যময়ী স্বর্ণময়ী আপন কীর্ত্তিতে আপনার জীবনী আপনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বর্গে, আমি মর্ত্ত্যের ভাষায়, তাঁহার মর্ত্ত্য-জীবন-ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। তাঁহার উচ্চ-চিত্তবৃত্তির পরিচয় অনেকেই পাইয়া থাকিবেন ; কিন্তু সে উচ্চ-চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া অনেকেই জানিতে না পারেন। সেই প্রক্রিয়াটুকু যতদূর সাধ্য প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সিদ্ধি কতটুকু হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকই তাহার বিচার করিবেন। তবে এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গ-কুল-ললনারা সেই পুণ্যময়ীর আদর্শে লক্ষ্য রাখিলে, আমি কৃতার্থ হইব।

বঙ্গবাসীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীমান বরদাপ্রসাদ বসুর নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহারই উদ্যোগে ও ব্যয়ে স্বর্গীয়া মহারাণীর জীবনীসম্বন্ধে প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মহারাণীর মহিমরাগে শ্রীমান বরদাপ্রসাদ বিমুগ্ধ। সে মহিমায় কে না মুগ্ধ? সেই ভরসায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
১৫ই বৈশাখ, ১৩১৪ সাল। } শ্রীবিহারিলাল সরকার

মহারাণী স্বর্ণময়ী

সার্ব্বজনিক শোক।

মহারাণী স্বর্ণময়ী বিগত ১৩০৪ সালের ১০ই ভাদ্র বুধবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় ইহ-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মরণ-পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার পীড়া তাঁহার চিকিৎসা, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা, তাঁহার অন্তিম অবস্থা সম্বন্ধে নানা মুখে নানা কথা নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। কালমাহাত্ম্যে সে সব জল্পনা আজ স্তিমিত বটে; কিন্তু এক দিন স্বর্ণময়ীর শোকে চারিদিকে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। আর একদিন এই বঙ্গভূমে সেই পুণ্যময়ী অন্নপূর্ণারূপিণী নাটোরের রাণী

ভবানীর জন্য এমনই হাহাকার হইয়াছিল। এই সার্ব্বজনিক শোক-সন্তাপের কাল-ব্যবধান শতবর্ষাধিক।

শতাব্দী পূর্ব্বে রাণী ভবানীর জন্য আর নয় বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্য যাহা হইয়াছিল, এ বঙ্গে এমনটী বুঝি আর কখন হয় নাই। বাঙ্গালার দুইটী অবলা বিধবা স্থবিরার জন্য যাহা হইয়াছে, কোন অসাধারণ লোকাতীত প্রতিভাসম্পন্ন নরোত্তম পুরুষ-প্রবরের জন্যও তাহা হয় নাই। সেই শতাব্দী পূর্ব্বের সার্ব্বজনিক শোকসন্তাপের কাহিনী কর্ণে শুনিতে পাই, এবং ইতিহাসে তাঁহার বর্ণনা দেখিতে পাই। আজিও এই মুহূর্ত্তে সেই সার্ব্বজনিক শোকসন্তাপ স্বয়ং শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছি এবং সেই সার্ব্বজনিক হাহাকার আর্ত্তরোল স্বকর্ণে শুনিতেছি। দয়াদাক্ষিণ্যে এবং দানপরোপকারে যে সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষিণী চুম্বকশক্তি নিহিত

আছে, তোমার সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে তাহা নাই। তাই সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, যাঁহারা আদর্শ মহাপুরুষ, তাঁহাদেরও অন্তর্ধানে এমন সার্ব্বজনিক শোকোচ্ছ্বাস দেখিতে পাই না। রাণী ভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দয়া-দাক্ষিণ্যে এবং দান-পরোপকারে অতুলনীয়া। দয়া তাঁহাদের নিত্য সহচরী এবং পরোপকার তাঁহাদের জীবনের মহাব্রত। এমন মহাপ্রাণা অন্নপূর্ণামূর্ত্তি আর কি দেখিয়াছ? ইহাঁদের অন্তর্ধানে এমন সার্ব্বজনিক শোক-সন্তাপ কি বিস্ময়কর? বিদ্যাসাগরের অনন্ত বিশ্ব-ব্যোমব্যাপিনী দয়া ছিল। তাঁহার দান ও জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতে সকল সময়ে অবিচার্য্যভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তবুও বিদ্যাসাগরের অন্তর্দ্ধানে এমন সার্ব্বজনিক শোকসন্তাপ অনুভূত হয় নাই, বলিলেও বোধ হয়, মিথ্যা বলিলাম না।

হয় ত এমন হিন্দু অনেক আছেন যে, ধর্ম্মবিগর্হিত সংস্কারানুষ্ঠান হেতু, বঙ্গের সেই বিরাটপুরুষ বিদ্যাসাগরের দয়া-দান-স্মৃতি তাঁহাদের সমবেদনার উদ্রেক করিতে পারে নাই। কিন্তু বল দেখি, বঙ্গে এমন একটী প্রাণী দেখিতে পাইতেছ কি যে, সেই করুণাময়ী দয়াশীলা স্বর্ণময়ীর অন্ত-র্দ্ধানে, দরবিগলিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়াছে? বল দেখি, বঙ্গে এমন একটী প্রাণীও কি দেখিতে পাও যে, সেই পুণ্যময়ী রাণী ভবানীর স্মৃতি চিত্তে সহসা উদ্ভাসিত হইলে, সেই ব্রাহ্মণকুমারী দেবীমূর্ত্তিকে বিনা আরাধনায় নিরশ্রুনয়নে হৃদ য় হইতে বিদায় দিতে পারিয়াছে?

হৃদয়ের বৃত্তিবিকাশ।

রাণী ভবানী বা মহারাণী স্বর্ণময়ী অপেক্ষা ধনবান্ বা ধনবতীর অস্তিত্বাভাব না হইতে পারে ; কিন্তু এমন দানশীলা এমন দয়াব্রতা আর দেখিয়াছ কি ? ধন থাকিলেও দয়া কি আর সবার থাকে ? ধন না থাকিলেও দয়ার বৃত্তি দানের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। "একই মন সকল লোকের সাধারণ সম্পত্তি" এই কথা মানিতে হইলে, বলিতে পারো, ধন না থাকিলেও উপচিকীর্ষা বৃত্তি না থাকিবে কেন ? প্লেটো যাহা ভাবিয়াছে, তুমিও তাহা ভাবিতে পার, ঋষি যাহা অনুভব করিয়াছেন, তুমিও তাহা অনুভব করিতে পার, যে কোন সময়ে মানুষের যে কোন কাজ হইয়াছে, তুমি তাহা সকলই বুঝিতে পার ; বিশ্বব্যাপী মনের রহস্যে যে প্রবেশ করিয়াছে সে কি না করিতে পারে ?" দার্শনিকের এই কথা মানিতে

হইলে, বলিতে পার, ধন না থাকিলেও পরের হিত সাধনার ইচ্ছা থাকিবে না কেন? কথা সবই সত্য। কিন্তু দয়া ও দানের স্ফূর্ত্তি-বিকাশের উপযোগী উপায় ধনবল। কাল ও অবস্থার অনুকূল অবলম্বন ভিন্ন প্রতিভারও বিকাশ হয় না। ধনের অবলম্বন না থাকিলে, দয়া ও দানের প্রকৃত সার্থকতা সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকের আর কোন কথা মান আর নাই মান, পাশ্চাত্য দার্শনিক এমার্সনের এই কথা মানিতেই হইবে,—

"We honor the rich, because they have externally the freedom, power and grace which we feel, to be proper to man.

কথাটা কি ঠিক নহে? ধনীকে মানি কেন? ধনীর বাহিরে শিষ্টসৌষ্ঠব আছে,—শক্তি-সামর্থ্য আছে,—স্বাধীনতা সচ্ছন্দতা আছে, ইহাই মনুষ্যত্বের উপযোগী!

অন্তর্ব্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি বাহ্য জগতের সহায়-সাপেক্ষ। শুদ্ধ জড়ে জড়ের প্রভাব নহে,

চেতনেও জড়ের প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। সমুদ্রে চন্দ্রের যেমন প্রভাবপরিচয় পাই, মানবেও কোন্ না পাইয়া থাকি? মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবনেই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মহারাণী দরিদ্রের কন্যা। কন্যাবস্থায় তিনি একাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পিত্রালয়ে তাঁহার দয়াবৃত্তি ও দানপ্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতার দারিদ্র্যহেতু দয়া হইলেও সকল সময় দয়ার পূর্ণানুষ্ঠানে কৃতার্থ হইতে পারিতেন না। দানের ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি সকল সময় প্রার্থীর ন্যায্য প্রার্থনানুসারে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না। যখন তিনি রাজাকৃষ্ণনাথের পত্নীরূপে মুর্শিদাবাদ রাজবংশের কুললক্ষ্মী কুলবধূ হইয়াছিলেন, তখন দয়াদানের সার্থকতা সম্পাদনের অপেক্ষাকৃত অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু হয়ত

স্বামী-শ্বশ্রূর অনভিপ্রায়হেতু, অনেক সময়ে মুক্তহস্ততার মহাব্রতে ব্যাঘাত ঘটিত। সুতরাং দয়াদানের চিত্তপ্রসাদে খুঁত রহিয়া যাইত। যখন তিনি অবাধে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন, যখন তিনি সর্ব্বময়ী সর্ব্বকর্ত্রীরূপে রাজসংসারের স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, যখন তিনি ভ্রূভঙ্গের সঙ্কেতে বা অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে অর্থব্যয়ের সদ্ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তি সঞ্চালন করিতে পারিয়াছিলেন, যখন বিপদভয়াবহ শত্রুরূপ রাহুকুলের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তগগনচারী শুভ্র শান্ত স্মিত স্বাধীন শারদ পূর্ণশশী সম এ বিশাল বিশ্বের বিমুক্ত বায়ু সেবনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তিনি দয়াদানের অসঙ্কোচ অনুষ্ঠানে এ জীবনের মহাব্রতে উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বল দেখি, মহারাণী দরিদ্রের কন্যা হইয়া যেরূপ দরিদ্র ছিলেন, আজীবন

যদি সেইরূপ দরিদ্র থাকিতেন, তাহা হইলে নিত্য দয়াময়ীত্বের বিভূতি সত্ত্বেও, কেহ এ জগতে স্বর্ণময়ীর নাম শুনিতে পাইত কি? হায়! দারিদ্র্যের কঠোর গিরিসঙ্কটে কত করুণার কুসুম ঝরিয়াছে, কে বলিতে পারে? দীনতার মহামরুক্ষেত্রে কত দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়াছে কে বলিতে পারে? ধনবল সত্ত্বেও যাহারা করুণাহীন, দানহীন, দয়াহীন, প্রেমহীন, তাহারা জগতের কৃপাধীন! সেই যক্ষ বা যক্ষিণীর ধন পথের পূতিগন্ধময় কোটি কোটি কীট কিল-কিলায়মান আবর্জ্জনাবৎ হেয় ও ঘৃণার্হ। তাহাদের নামেও মহাপাপ আর দরিদ্র হইলেও, যাহাদের দয়া আছে, তাহাদের নামেও মহাপুণ্য।

হৃদয় ও কার্য্যের তুলনা।

রাণী ভবানী ব্রাহ্মণকন্যা, মহারাণী স্বর্ণময়ী তিলিবংশীয়া। বংশে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ; হৃদয়ের পরিসরে কিন্তু প্রভেদ নাই। তবে হৃদয়ের পরিসরে প্রভেদ না থাকিলেও, কোন কোন কার্য্যপ্রকৃতিতে প্রভেদ ছিল। ইহা কেবল কালধর্ম্মের ফলভেদ মাত্র। রাণী ভবানীর কালে যাহা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত, রাণী ভবানী তাহার পূর্ণ পালন করিয়াছিলেন। এ কালে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বলিয়া পরিচিত, এমন অনেক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সে কালে কল্পনারও সীমাবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণসেবা গো-দেবের পূজা, গ্রহ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণপ্রতিপালন, দীন-দুঃখীর কষ্টবিমোচন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান, বিধবার অন্নসংস্থান প্রভৃতি সে কালের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। রাণী ভবানী কায়মনোবাক্যে

সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পালন করিয়াছিলেন। এ সব এ কালেরও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। পরিমাণে ততোধিক না হইলেও মহারাণী স্বর্ণময়ী এ কর্ত্তব্য পালনে ক্রুটী করিতেন না। তবে স্কুলের সাহায্য জন্য, হাসপাতালের সাহায্য জন্য, সভা-সমিতির সাহায্য জন্য, পুস্তক প্রণয়নের সাহায্য জন্য, বিজ্ঞানোন্নতির সাহায্য জন্য, দানকল্প রাণীভবানীর কালধর্ম্মের কল্পনাতীত। আজ কাল এগুলি এ কালধর্ম্মে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে এসব কার্য্যে অকাতরে সাহায্য করিতে হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয়, এমন একটী কার্য্যও হয় নাই, যাহাতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর সাহায্য সহানুভূতি ছিলনা। রাণী ভবানীর যুগে বিদেশী বিধর্ম্মীকে সাহায্য করিবার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয় নাই। মহারাণী স্বর্ণময়ীর কালে সে আবশ্যকতার শুধু সৃষ্টি নহে, পুষ্টি হইয়াছে।

বিধর্ম্মীর প্রোটেষ্টাণ্ট হোমেও মহারাণীকে অর্থ সাহায্য করিতে হইয়াছিল। তাই বলি, রাণী ভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর হৃদয়ে প্রভেদ না থাকিলেও কার্য্যপ্রবৃত্তিতে প্রভেদ ছিল। তাই মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম, ভারত সীমা ছাড়াইয়া, ইউরোপের সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাই মহারাণীর শোকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, হা হতোস্মি বলিয়া কাঁন্দিয়া ভূমে লুটাইয়াছিল। উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়াছে; মান্দ্রাজ-বোম্বাই নীরব অশ্রুধারে অভিষিক্ত হইয়াছে, আর সুদূর ইউরোপভূমি সদগুণালঙ্কৃত সাধুর অভাব জন্য সাধারণ শোকধর্ম্মে মলিন বদনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের উৎকণ্ঠিত সহানুভূতি দেখাইয়াছে।

জীবনের তুলনা।

বর্ণ বৈষম্য থাকুক; রাণী ভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবন-ঘটনায় কিন্তু বৈষম্য-বিরোধ সামান্য মাত্র; পরন্তু সামঞ্জস্য অনেকাংশে। রাণী ভবানী সুরূপা ও সুলক্ষণা ছিলেন; মহারাণী স্বর্ণময়ীর রূপ লক্ষণের বোধ হয়, তুলনা মিলিত না। বৈধব্যে রাণী ভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী উভয়েরই দুর্ভাগ্য সূচনা; তবে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বৈধব্যহেতু পতির অপমৃত্যু; রাণী ভবানীর বৈধব্যহেতু পতির স্বভাবমৃত্যু। রাণী ভবানী বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া একদিন পথের ভিখারিণী হইয়াছিলেন, মহারাণা স্বর্ণময়ীকেও একদিন পথে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। বিষয়-বিপর্য্যয়ে রাণা ভবানীর সীমন্তে সধবার সুকৃতি-সঙ্কেত সিন্দূররাগ সমুজ্জ্বল ছিল। সধবার সুকৃতি

ভোগেই সে বিষয়ের উদ্ধার হইয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে বৈধব্যের দাবানল বুকে বহিয়া এবং বিপদ বিপর্য্যয়ের বিধূম-বহ্নির স্তূপে বিচরণ করিয়া বিষয়ের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। রাণী ভবানী যে রাজবংশের কুল-লক্ষ্মী, সে রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্বপুরুষেরা "দিন আনা,—দিন খাওয়া" পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিষয় প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয় অন্যরূপ নহে। তবে উভয় বিষয় প্রতিষ্ঠাতায় যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, ইতিহাসে বা সাহিত্যে তাহার অপলাপ হয় নাই। রাণীভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর সদ্ব্যয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। পিতৃকুলভাগ্যে রাণী ভবানী যেমন, মহারাণী স্বর্ণময়ীও তেমনই। উভয়েই দরিদ্র পিতৃকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর সুপবিত্র জীবন বৃত্তান্তে ইতিহাস ও সাহিত্যের পৃষ্ঠা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবনগৌরব এইখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

বিষয়প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্ব পরিচয় না দিলে, মহারাণীর গৌরব গুরুত্বের পূর্ণানুভব সম্ভবপর নহে বলিয়া, সর্ব্বাগ্রে সেই পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

কান্ত বাবু।

কেমন করিয়া স্ফুলিঙ্গে দাবানল, বীজে-বৃক্ষ, অণুতে পর্ব্বত, বিন্দুতে অম্বুধি হয়, দেখুন। মুর্শিদাবাদ রাজবংশের রাজা কৃষ্ণনাথ মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী। কৃষ্ণনাথের প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ কান্ত বাবু এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কান্ত বাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপীগ্রাম বা সিজনা গ্রামে বাস করিতেন। তথা হইতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইহাঁরা

কাশীমবাজারের নিকট শ্রীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান কাশীমবাজার রাজবাটী সেই শ্রীপুরে অবস্থিত। কান্ত বাবুর দুই তিন পুরুষ হইতে রেশমের ও সুপারির ব্যবসায় চলিয়া আসিয়াছিল, ইহাঁরা ধনশালী ব্যবসায়ী না হইলেও কখন অন্নবস্ত্রের কষ্ট ভোগ করেন নাই। ইহাঁরা এক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ নন্দী সুপ্রসিদ্ধ কান্ত বাবুর পিতা। কোন কোন মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা সীতারাম, এবং কাহারও কাহারও মতে পিতামহ অর্থাৎ সীতারামের পিতা কালী নন্দী প্রথমে কাশীমবাজারে আগমন করেন। রাধাকৃষ্ণ বর্দ্ধমান জেলার কুড়ুম্ব গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিতে তিলি। অনেকে তাঁহাদিগকে তেলি বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। সেই জন্য সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে Oliman বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-

ছেন। বাস্তবিক তাঁহারা তেলি নহেন,—তিলি। রাধাকৃষ্ণের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত। এই কৃষ্ণকান্ত 'কান্ত বাবু' বলিয়া সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের রেশমের ও সুপারির ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতেন। রাধাকৃষ্ণ নিজে ভাল ঘুঁড়ী উড়াইতে পারিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে খলিফা বলিয়া অভিহিত করিত। কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠী ও রেসিডেন্সির নিকট তাঁহাদের দোকান ছিল। কুঠীর লোকদিগের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় হয়। কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে বাঙ্গালা, ফরাসী এবং সামান্যরূপ ইংরেজী শিক্ষা করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, কান্ত বাবু দুই হাজার ইংরেজী শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার হিসাব-পত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকায় কান্ত বাবু কাশীম-

বাজারের ইংরেজদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কান্ত বাবু কাশীমবাজারে ইংরেজ কুঠীতে একজন মুহুরীপদে নিযুক্ত হন। রেশমের ব্যবসায়ে কান্ত বাবুর ব্যুৎপত্তি ছিল। এই জন্য কান্ত বাবুর শীঘ্র পদোন্নতি হইয়াছিল। এই সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ইংরেজ বণিকের একজন নিম্নতর কর্ম্মচারী ছিলেন। হেষ্টিং-সের সহিত কান্ত বাবুর পরিচয় হইয়াছিল। এই পরিচয়েই কান্ত বাবুর ভবিষ্যৎ সৌভা-গ্যের সূচনা।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় হেষ্টিংস্ মুরশিদা-বাদে ছিলেন। এই সময় কলিকাতার গভর্ণর-ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজগণ কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে নবাব-সরকারের যাবতীয় সংবাদ গোপনে গোপনে প্রেরণ করিতেন।

ক্রমে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হয়। হেষ্টিংস্ নবাবের ভয়ে পলাইয়া কান্ত বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন কান্ত বাবু "কান্তমুদী" ছিলেন। * নবাব হইতে ঘোষণা হইয়াছিল, যে হেষ্টিংস্কে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কান্ত প্রাণদণ্ডের ভয় করিলেন না। যেন কমলা মাভৈঃ মাভৈঃ রবে কান্তের কাণে কাণে বলিলেন,—"তোমার ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে নির্ভীকচিত্তে হেষ্টিংস্কে (আশ্রয় দাও) হেষ্টিংস্কে কান্তের আশ্রয়ে পান্থা ভাত, ও চিংড়ি মৎস্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। পরে হেষ্টিংস্ কান্ত বাবুর সাহায্যে গোপনে পলাইয়াছিলেন। পলাইবার সময় হেষ্টিংস্ কান্তকে এক নিদর্শন-পত্র দিয়া

---

* কেহ কেহ বলেন, কান্ত বাবুর মুদীর দোকান ছিল। হেষ্টিংস্ তাঁহার দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন, তাহা হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব।"

ইংরেজ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা ইংরেজের জাতীয় চরিত্রে অনুপ্রাণিত। হেষ্টিংস্ শত অপরাধে অভিভুক্ত হইতে পারেন; সত্য সত্য বহু অপরাধে বিলাতে তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়াছিল; কিন্তু হেষ্টিংসের কৃতজ্ঞতা অপরিমেয় ও অতুলনীয়। হেষ্টিংস্ কান্ত বাবুকে ভুলেন নাই। কান্ত বাবু তাঁহার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরূক থাকিত। যিনি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া, হেষ্টিংসের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি হেষ্টিংসের প্রাণের দেবতা হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ ১৭৫০খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে

পারিতেন না। হেষ্টিংস্ যখন রেসিডেন্ট হন, তখন কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইবার অধিকার পান্। হেষ্টিংস্ ব্যবসায় করিতেন। কান্ত বাবু হেষ্টিংসের মুৎসদ্দি নিযুক্ত হইলেন। "কান্তমুদী" কান্ত বাবু হইলেন। সৌভাগ্যের সূত্রসঞ্চার হইল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ বিলাতযাত্রা করেন। এই সময় হেষ্টিংসের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হয়। তিনি কান্ত বাবুর নিকট হইতে বার সহস্র টাকা চাহিয়াছিলেন। কান্ত বাবু টাকা দিতে পারেন নাই। ইহাতে হেষ্টিংস্ কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণদাতা উপকারী কান্ত বাবু প্রকৃতই টাকা দিতে অক্ষম। কান্ত বাবু তখনও হেষ্টিংসের হৃদয়ের দেবতা।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস মাদ্রাজের গবরণর হন। এবারও তিনি কান্ত বাবুকে আপনার

মুৎসদ্দি করিয়াছিলেন। এই সময় নিয়ম হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না। হেষ্টিংস্ মুৎসদ্দি কান্ত বাবুর নামে বা বেনামে ব্যবসা চালাইতেন এবং জমিদারী ফারম প্রভৃতি ইজারা লইতেন। ইহাই কান্ত বাবুর আর এক সৌভাগ্য স্তর।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ গবরণর জেনারল নিযুক্ত হন। এইবার তিনি কান্ত বাবুকে অনেকগুলি বড় বড় জমিদারী ও ফারম ইজারা করিয়া দেন। কান্ত বাবুর প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল। কান্ত বাবুকে জমিদারী ফারম প্রভৃতি দিবার জন্য হেষ্টিংস্‌কে অনেক অসদুপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কান্ত বাবুর জন্য হেষ্টিংস্ এ দেশের অনেক জমিদারের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। হেষ্টিংস হয়ত মনে করিতেন, কৃতজ্ঞতায় সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত

হইবে। হেষ্টিংস রাণী ভবানীর বাহারবন্দ জমিদারী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কান্ত বাবুকে দিয়াছিলেন। বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত ও আয়কর জমিদারী। এই বাহারবন্দ আজিও কাশীমবাজার রাজ-বংশের অধীন আছে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও লাভকর। বাহারবন্দ ব্যতীত হেষ্টিংস কান্ত বাবুকে আরও অনেক জমি-দারী ও কোন কোন লবণের ফারম ইজারা করিয়া দেন। কান্ত বাবুর জন্য হেষ্টিংস অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রাহ্য করিতেন না। ক্রমে ক্রমে কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথের নামে অনেক জমিদারী গৃহীত হইয়াছিল। হেষ্টিংসের অনুগ্রহবলে বাহারবন্দ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কান্ত বাবুকে আর অধিক রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেষ্টিং-সের আদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের সময় তাহাই বাহাল থাকে। অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজবংশ সেই অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে কান্ত বাবুর জমিদারী বাড়িতে লাগিল। বহুল অর্থাগমের আরও উপায় উপস্থিত হইল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস কাশীর রাজা চেৎসিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। চেৎসিংহ আপনার পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। পরিবারবর্গ ইংরেজের হস্তগত হইয়াছিলেন। পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। কান্ত বাবু অত্যাচার নিবারণের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কান্ত বাবু রাজমাতার নিকট হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সব অলঙ্কার মুরশিদাবাজ রাজ-ভবনে দেখিতে পাওয়া যায়। কান্ত বাবু কাশীর লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে

কাশীর রাজভবন হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ রামচন্দ্রী মোহর, একমুখ রুদ্রাক্ষ ও দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ লুণ্ঠনের অংশস্বরূপ আনিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি একটী পাথরের দালান আনিয়া কাশীমবাজারের বাটীতে রক্ষা করেন। আর এক উপায়ে কান্ত বাবুর ধন বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। হেষ্টিংসের প্রিয়-পাত্র কান্ত বাবু উৎকোচে হটিতেন না। উৎকোচ প্রাপ্তির সহস্র পথ মুক্ত ছিল!

কান্ত হেষ্টিংসের কৃপায় অতুল ধনের অধিকারী হইলেন। দরিদ্র কান্ত মুদী কান্ত বাবু নামে কোটিপতি হইলেন। বাঙ্গালা বিহার এবং উত্তর-পশ্চিম সর্ব্বত্রই তাঁহার জমিদারী বিস্তৃত হইল। কান্ত বাবু হেষ্টিংসের নিকট হইতে একটী সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, কান্ত

বাবুর উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হইত। কান্ত বাবুর এখন অতুল সম্পত্তি,—অসীম প্রতিপত্তি। পথের ভিখারী রাজরাজেশ্বর।

কমলার কৃপায় কান্ত কোটিপতি; কিন্তু কান্ত বাবু জানিতেন, হেষ্টিংস কি অসদুপায়ে তাঁহার জন্য জমিদারী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কান্ত বাবু জানিতেন, কি উপায়ে হেষ্টিংস পবিত্র-চরিত্রা অন্নপূর্ণা রাণী ভবানীর বাহার-বন্দ জমিদারী লইয়া কান্ত বাবুকে দিয়াছিলেন। ইহাতেই বলিতে হয়, কান্ত বাবুর বিষয়প্রতিষ্ঠায় পাপস্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডেও কান্ত বাবু প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উৎকোচ গ্রহণও কি পাপাত্মক নহে?

হেষ্টিংস্ কান্তবাবুকে রাজোপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন। কান্তবাবু স্বয়ং উপাধি না লইয়া, পুত্র লোকনাথকে উপাধি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত

হইয়াছিল। কান্ত বাবু দেওয়ান্ কৃষ্ণকান্ত নামে অভিহিত হইতেন। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে আর একজন কৃতীপুরুষও মুরশিদাবাদের ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন। ইনি বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সেনবংশীয়দের আদি পুরুষ।

১২০০ সালের পৌষ মাসে কান্তবাবু জাহ্নবীতীরে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অর্থার্জ্জনে কান্ত বাবু অনেক সময় অসদুপায়ের প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার হৃদয় একেবারে হিন্দুজনোচিত ধর্ম্ম-ভাব-শূন্য ছিল না। *

---

* কান্ত বাবুর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত "মুরশিদাবাদ কাহিনী" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। নিখিল বাবুর কৃতবিদ্য, বহুতত্ত্বজ্ঞ সুলেখক। "মুরশিদাবাদকাহিনী" অতি উপাদেয় অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। মুরশিদাবাদকাহিনীতে কান্ত বাবুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে নিখিল বাবুর ভাষা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

বলিহারী হেষ্টিংসের কৃতজ্ঞতা। পাপ পুণ্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। কৃতজ্ঞতা কি পুণ্য নহে? ইহার কি ফল হইবে না! পাপের শাস্তি হইবে, পুণ্যেরও পুরস্কার হইবে, আর কান্তবাবু! তুমি যে অসদুপায়ে ধন অর্জ্জন করিয়াছিলে, তাহার ফলও তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে নিশ্চিতই। কেবল ইহকাল লইয়া ত কথা নহে;—পরকালও একটা আছে। কিন্তু তোমার যাহা অসদুপায় অর্জ্জিত, তোমার বংশের কুলবধূ গরীয়সী পুণ্যময়ী স্বর্ণময়ী সদ্ব্যবহারে তাহার সদ্গতি করিয়াছেন। তোমারও কি সদ্গতি হইবে না?

রাজা লোকনাথ।

কান্ত বাবুর জীবিতাবস্থায় পুত্র লোকনাথ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোকনাথ বহুসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বে বঙ্গে আর হয় নাই।

পরে মাতৃশ্রাদ্ধে রাজা নবকৃষ্ণ বারো লক্ষ এবং দেওয়ান গোবিন্দ সিংহ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কান্ত বাবুর জীবিত কালেই রাজা লোকনাথ জমীদারী কার্য্যে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এ অভিজ্ঞতাফলে জমীদারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকদিন তিনি ঐশ্বর্য্য সুখভোগ করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর তের বৎসর পর তিনি শিশুপুত্র হরিনাথকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজা হরিনাথ।

রাজা লোকনাথের যখন মৃত্যু হয়, হরিনাথের বয়স তখন একবৎসর মাত্র। শিশু হরিনাথের বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। হরিনাথ শৈশবে পিতৃহীন

হইয়াও রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কোন্ পুণ্যবলে জানি না, ইংরেজী শিখিয়া হরিনাথের মতিগতি বিকৃত হয় নাই। তিনি সতত স্বধর্ম্মনিরত হইয়া দ্বিজ-দেবতার সেবা পূজা করিতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে রাজা হরিনাথ পনের হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এ দানে পুণ্য কি, অপুণ্য, তাহার বিচার করিব না। সে বিচারে ফলও নাই। তবে এই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল, হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, অনেক বাঙ্গালীর ছেলে, হিন্দু কলেজে পড়িয়া, ইংরেজী সাহিত্য বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। এই হিন্দু কলেজের কথায় হোরেস্ হেমান উইলসন্ সাহেব, স্বজাতির গর্ব্বখ্যাপনে বলিয়াছিলেন,—"হিন্দু কলেজে পড়িয়া বাঙ্গালীর ছেলেরা, প্রকৃতই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন

প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে”। পরন্তু ইহাও তাঁহার একটা গর্ব্বের গরীয়ান্ হেতু,—“হিন্দু কলেজে পড়িয়া ইংরেজী শিখিয়া হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা কুসংস্কার-বিশিষ্ট নহে,—অর্থাৎ অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ছেলের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা নাই। এবং হিন্দুর ক্রিয়া কলাপে শ্রদ্ধা নাই।” * হাঁ। ইহা অমিত-মান শিক্ষিত ইংরেজ অধ্যাপকের প্রকৃত গৌরবের কথা বটে। তুমি হিন্দুসন্তান কি বুঝ? আমরা উইলসন্ সাহেবের গৌরব সার্থকতাটুকু আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাই,—

হিন্দু কলেজে পড়িয়া, যাঁহারা মূর্ত্তিমান্ বিদ্বান্ হইতেন, তাঁহাদের অনেকে তখন বুঝিয়া ছিলেন এবং বুঝাইতেন, ভাত ডাল শরীরের পুষ্টিকর নহে; সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং

---

* মৎ প্রণীত “বিদ্যাসাগর” নামক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ৫১ পৃষ্ঠা।

বলকারক স্বাস্থ্যকর ভাবিয়া, মহামাংসের সম্মান করিতেন এবং তাহার সর্ব্বসাধারণ সম্মান সম্বর্দ্ধনার জন্য যুক্তিপ্রদান করিতেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাটীতে ভুক্ত অখাদ্যের মেদ-মাংস উৎকীরণে তাঁহাদের ইংরেজি বিদ্যা-শিক্ষা সঞ্চিত কৌতুক-বৃত্তি চরম চরিতার্থ হইত। পটলডাঙ্গার গোলদীঘির ধারে, নর-চক্ষুর গোচরে মদ খাইতে না পারিলে, ইংরেজি বিশ্বকোষে, তাঁহাদের জীবনচরিত কাপুরুষতার কলঙ্ককালিমায় বিলেপিত হইবে, ইহা তখন হিন্দুকলেজে-পড়া অনেক ইংরেজি শিক্ষিত যুবার স্বতঃসিদ্ধান্ত ছিল। আর নহে! লেখনী সরমে মরমে থর থর কাঁপিতেছে।

দেশের লোকে ইংরেজি শিখিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, রাজা হরিনাথের হয়ত এ ধারণা ছিল। হিন্দু কলেজে পড়িয়া প্রকৃত কি হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন প্রত্যাদেশ পান নাই; বিধাতা তাঁহাকে ভবিষ্যদৃষ্টিও দেন

নাই। তিনি আত্মবৎই ভাবিয়াছিলেন। আপনি যখন ইংরেজি শিখিয়া মাতৃস্তন্যে কৃতঘ্নতা করেন নাই, তখন ভবিষ্যৎ কুলাঙ্গারদের কৃতঘ্নতা ধারণা কিরূপে হইবে? হিন্দু কলেজে দান ব্যতীত রাজা হরিনাথ অনেক সৎকার্য্যেও দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের প্রসিদ্ধি ছিল। জলকষ্টে পুষ্করিণী কূপাদি খনন করিয়া এবং অন্নকষ্টে অন্নসত্র খুলিয়া আর্ত্তপ্রজাকুলের নিত্য আশীর্ব্বাদভাজন হইতেন। বাঙ্গালীকে ক্রমে বলহীন ও তেজোহীন হইতে দেখিয়া, রাজা হরিনাথ মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেন। এই জন্য দেশের লোককে বলিষ্ঠ পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ব্যায়ামকারীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সতত উৎসুক থাকিতেন। রাজা হরিনাথ আদর্শ জমিদার ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিস্মৃতি এখনও এদেশবাসীর মনে নিত্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ১২৩৬ সালের ১৮ই অগ্র-

হায়ণ বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিনাথ পার্থিব বিষয় সম্পত্তি, পুত্র কৃষ্ণনাথ, পত্নী রাণী হর-সুন্দরী, কন্যা গোবিন্দসুন্দরী এবং অপার্থিব পদার্থ কীর্ত্তিপুষ্ট পদাঙ্ক রাখিয়া পরম পথে প্রয়াণ করেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ।

রাজা হরিনাথের যখন লোকান্তর হয় কৃষ্ণনাথ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইল। কৃষ্ণ-নাথের লেখাপড়া শিক্ষাব্যববস্থার কোন ত্রুটী হয় নাই। তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতাপ প্রবল না হউক; ফলে কিন্তু তাহা পুষ্ট হইতেছিল। মুসলমান রাজাদের রাজত্ব-কালে যে পারসী ভাষা প্রতাপান্বিত হইয়া এ দেশে প্রোথিতমুল হইয়াছিল, ইংরেজ-রাজ-ত্বের প্রথম যুগে তাহার মুল শিথিল হইয়া-

ছিল বটে; উৎপাটিত হয় নাই। তখন ইংরেজি শিক্ষার জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে; পারস্য শিক্ষায় ভাঁটা পড়িতেছে। উন্মাদিনী স্রোতস্বতী যেমন পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া, ভূতলে পতিত হইবার সময়, প্রবল উচ্ছ্বাসে দুকূল ভাসাইয়া লইয়া যায়; ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের বঙ্গদেশ ঠিক যেন সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কৃষ্ণনাথ এই তোড়ের মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি ওয়ার্ডের অধীনে থাকিয়া ইংরেজি ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হোরেস্ উইলসন সাহেব, ইংরেজি শিক্ষার ফলগৌরবের যে গর্ব্ব করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাথ সর্ব্ব রকমে না হউক, অনেকাংশে তাঁহার সার্থকতা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের দোষও ছিল, গুণও ছিল। অথাদ্যো অপেয়ে দোষের প্রমাণ, দয়া দানে গুণের গরিমা। ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহ ছিল। ইংরেজি আচার-ব্যবহারে

ভক্তিমতি ছিল। সদ্ব্যয়ে অপব্যয়ে তাঁহার অনেক অর্থ ক্ষয় হইয়াছিল। ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী স্বর্ণময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখনও কৃষ্ণনাথ নাবালক। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হন। পর বৎসর লর্ড অকলণ্ড কুমার কৃষ্ণনাথকে রাজোপাধি প্রদান করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি শিক্ষক কলিকাতা-ঝামাপুকুরের ৺ রাজা দিগম্বর মিত্রকে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন সঙ্কল্পে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ রূপসৌন্দর্য্যে জীবনসঙ্গিনী স্বর্ণময়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

মৃগয়ায় কৃষ্ণনাথের পরম প্রীতি ছিল। রাজ্যসুখ, বিষয় ভোগ পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফল; কিন্তু রাজা কৃষ্ণনাথ বহুদিন এ সুকৃতি

ভোগ করিতে পারেন নাই। বিধাতঃ! তোমার লীলাচক্র দুর্নিরীক্ষ্য! কিসে কি করিতেছ, কে বুঝিবে? এই সুকুমার অলোক-সুন্দর অতুল ধনেশ্বর রাজা কৃষ্ণনাথের অকালে একি পরিণাম হইল! একি! অভিমানে অবোধ কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিল!

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণনাথ কলিকাতা চিৎপুর রোডে যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পিস্তলের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।* এই অপঘাতে অপমৃত্যু সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের স্থানীয় সংবাদপত্র "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

গোপাল দফাদার নামে রাজা কৃষ্ণনাথের অধীন কোন লোক মূল্যবান্ দ্রব্যপূর্ণ

* কলিকাতায় কান্তবাবুকে কার্য্যসূত্রে থাকিতে হইত। এই সময় জোড়াসাঁকোতে তিনি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। এখনও এ বাড়ী বর্ত্তমান আছে।

কয়েকটী বাক্স চুরী করার সন্দেহে তাঁহার ভৃত্যবর্গকর্ত্তৃক প্রহৃত হয়। গম্ভীর সিংহ নামে তাঁহার কোন সিপাহী তজ্জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় রাজা কৃষ্ণনাথও অভিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব রাজাকে ধৃত করিবার জন্য নাজির ও আরও কতিপয় লোক পাঠান; কিন্তু তাহারা কাশিমবাজার রাজবাটী হইতে রাজাকে ধৃত করিতে সমর্থ না হওয়ায় বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজাকে ধরিবার জন্য কাশিমবাজার রাজবাটী ঘেরাও করেন। রাজা ধরা দিলে, তাঁহাকে ৫০ হাজার টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হয়। এই চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বড় বংশের সহিত সম্পর্ক থাকায় তিনি কিছু দাম্ভিক প্রকৃতি হন, এইজন্য রাজা কৃষ্ণনাথকে যথো-

চিত সম্মান না করিয়া তিনি তাঁহাকে বিশেষ রূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজা কাশিমবাজার হইতে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাটীতে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কলিকাতা হইতে থানা বথানা চালান হইয়া বহরমপুরে আসিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করেন। রাজা সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া পিস্তলের দ্বারা আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের পত্রে জানা যায় যে, তিনি গোপালের প্রতি অত্যাচার ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সেই পত্র পাঠ করিলে নেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"I Sri Rajah Chrisnonath Roy write, I part with the desire of life solely from the fear of being disgraced as I was not concerned in the matter of Gopal's case, nor did I beat

or maltreat him. This I Solemnly avow. It is only on account of the Deputy Magistrate Chandromohan Chatterji, that such excessive measures have been adopted towards me, I therefore write this letter that no one else may incur blame on account of my parting with my own life.

"Everything is written in my will and Testerment. ইত্যাদি।

এই পত্রের ভাব এই, গোপালের মোকদ্দমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি তাহাকে মারি নাই। পাছে অপমানিত হই, এই ভয়ে আমি আত্মহত্যা করিলাম। ডেপুটী চন্দ্রমোহনের জন্য এই চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইল। আমার আত্মহত্যার জন্য কেহ দায়ী নহে। সকল কথা আমার উইলে আছে।

ডেপুটী চন্দ্রমোহন মনে করিয়াছিলেন, ধন, মান, সম্পদের বিচার না করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। ন্যায়ের মাহাত্ম্য রক্ষা করিবেন। ডেপুটী চন্দ্রমোহন রাজা

কৃষ্ণনাথকে লইয়া টানাটানি করিলেন। মামলায় দাঁড়াইলে কিছুই হইত না। ততদূর না করিলেও চলিত। কিন্তু অভিমানী যুবক কৃষ্ণনাথ ভয়ে আত্মহারা হইয়া আত্মহত্যা করিলেন।

সব ফুরাইল! অকালে কুসুম শুকাইল! মুরশিদাবাদ আঁধার হইল! কৃষ্ণনাথের অপঘাতে অপমৃত্যু হইল। এ অপমৃত্যু কেন হইল? কেন হইল,—তুমি আমি কি বলিব? মূঢ় আমরা,—আমাদের মনে কত কি হয়; মনে হয়, কৃষ্ণনাথ যদি ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজী ভাবাপন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত আত্মহত্যা করিতে পারিতেন না। হিন্দুর সন্তান হিন্দুর শিক্ষা পাইলে, হিন্দু-সন্তানের হিন্দুশাস্ত্রে মতিগতি থাকিলে, হিন্দুর সন্তান হিন্দুশাস্ত্রের শাসনে থাকিলে মুক্তকণ্ঠে বলিবে, "আত্মহত্যা মহাপাপ!" হিন্দু বলিবে যে, "বিধাতার ইচ্ছায় যাহা হয় হউক।"

কি তুচ্ছ ডেপুটীর তাড়না। জেলে পচাইয়া মারুক, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিউক, বিষ খাওয়াইয়া মারুক, মশানে দিউক, শূলে দিউক, আত্মহত্যা করিয়া অনন্ত নরকে যাইব কেন? আবার ইহাও মনে হয়, কৃষ্ণনাথের অপমৃত্যুরূপ অমঙ্গলে একটা মহা মঙ্গলের সূচনা হইল। কৃষ্ণনাথ না মরিলে হয়ত কৃষ্ণনাথের অপব্যয়ে মুরশিদাবাদ রাজবংশ ঋণগ্রস্ত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইত; হয়ত রাজবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না; হয়ত মুরশিদাবাদের বিপুল বৈজয়ন্তী পুরী গঙ্গা-গর্ভে বিলীন হইত; তাহা হইলে দীনদয়া-ময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে কোথায় পাইতাম? তাহা হইলে কেমন করিয়া কোটি কোটি কণ্ঠশ্বাস প্রাণী, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত্ত পীড়িত জীব মরণে পরিত্রাণ পাইত? মনে হয় কোটি কোটি জীবের জীবন রক্ষার জন্যই বিধাতা একটী মাত্র কৃষ্ণনাথের জীবন লই-

লেন। মঙ্গলময়ীর রাজ্যে অমঙ্গল হইতে মঙ্গলই হয়। কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যারূপ অমঙ্গল হইতে কোটি কোটি জীবের জীবন রক্ষারূপ মঙ্গল হইল কি না, বিধাতঃ! তুমিই জান। তবে পূর্ব্বজন্মের কৃতাকৃতের ফল ইহজন্মে ভুগিতে হয়, এ কথা কিন্তু ভুলি নাই।

রাজা কৃষ্ণনাথের সময় ভাস্করপত্র প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল। লোকে ইহার আদরও করিত। ইংরেজির তুমুল তোড়ের মাঝে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এত আদর, ইহা একটা সুখের কথা বটে; কিন্তু তখন যেরূপ বিমুক্ত-ভাবে পরনিন্দার চর্চ্চা হইত, তাহা প্রার্থনীয় নহে। ঘাসিরামের ঝোলা হইতে সদ্য নিষ্কা-সিত চানাচুরের মতন পরনিন্দা সহজ মুখ-রোচক; গরম গরম লাগে ভাল। এইজন্যে আমাদের মনে হয় যে, ভাস্করের আদরটা কিছু উৎপ্রেক্ষায় পৌঁছিয়াছিল। এ কথা

মনে হওয়ায় বোধ হয়, পাঠক! বড় অপরাধ হইতে পারে না। আজকালও সংবাদপত্রের গুণে ভূয়োদর্শনে বুঝা যা॰ না কি, পরনিন্দা পাঠকের বেশী প্রিয় ; পরন্তু মুখরোচক! পরনিন্দা মহাপাপ বো॰ে রাম রাম শব্দে যাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলি না দিয়া থাকিতে পারেন না, যে সংবাদপত্রে প॰নিন্দাটা বেশী বেশী থাকে, তাঁহারা সে সং॰াদপত্রের গ্রাহক হন না। আমরা কিন্তু ॰খিতে পাই, এই সব পরনিন্দা শ্রবণ-পঠনবিম॰ মহাত্মাদের বাড়ীতে পরনিন্দাচর্চ্চী সংবাদপ॰ নিত্য বিরাজমান থাকে। তবে ইহা নি॰কই, হয় তাঁহাদের কুলবধূ না হয় কুলকন্যা॰ন, এই সব সংবাদ-পত্রের গ্রাহিকাভুক্তা। পরনিন্দাচর্চ্চী সংবাদ-পত্রের পিতৃশ্রাদ্ধকালে এই সব মহাত্মা ঐ সব সংবাদপত্রের বি॰ষ্য, বিশেষণ, অব্যয়-টীর পর্য্যন্ত পিণ্ড রচনা॰ করেন। বলিতে পারেন, তাঁহারা গ্রাহক নহেন, পাঠক নহেন,

তবে বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতির সঞ্চয় হয় কিরূপে? এ তত্ত্বের নির্ণয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

আজকাল আইনের যেরূপ কড়াকড়ি, আর আজকালের লোকেরা যেরূপ ঠনঠনে, সহজে ইসারায় কোন কথা বলিবার যো নাই। তাহা হইলে, পঞ্চানন্দের ভাষায় বলি,—তুড়ুঙ্গ। ভাস্করের সময় শুনিয়াছি, ইসারায় বা ইঙ্গিতে কাহারও নামে কোন কথা লেখা হইলে, যাহার কথা হয়, তিনি কোন রকমে সংবাদপত্র-সম্পাদকের মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। ভাস্করে এক সময় রাজা কৃষ্ণনাথের নামে কি কুৎসা রচিত হইয়াছিল। পূর্ণ অভিমানী রাজা কৃষ্ণনাথ ভাস্করের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে মাননাশের নালিশ করিয়াছিলেন। বিচারে গৌরীশঙ্করের দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

স্বর্ণময়ী

১৭৫১ শকাব্দা ইংরেজী ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৩৬ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে দরিদ্রের কুটীরে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাটাকুলে তাঁহার "সারদাসুন্দরী" নাম ছিল। সারদাসুন্দরী,—সারদাসুন্দরী বটে। যেমন রূপ, তেমনই সৌন্দর্য্য,—তেমনই মাধুর্য্য। সারদাসুন্দরী একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই একাদশ বৎসরকাল তিনি রূপে গুণে দেবকন্যারূপে পল্লীর প্রত্যেক প্রতিবেশীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। গুণে রমা,—রূপে তিলোত্তমা। দরিদ্রের কন্যা বটে; কিন্তু করুণায় কমলা। এখন আমরা বলি, মহারাণী স্বর্ণময়ীর মতন দয়া আর কাহারও নাই; তখন ভাটাকুলের অধিবাসীরা

মনে করিত, এ জগতে সারদাসুন্দরীর মতন দয়া আর কাহারও নাই। যে মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসাহারার ব্যবস্থা করিয়া বা এককালে অর্থসাহায্য করিয়া বিধবার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাসুন্দরী ক্ষুদ্র পল্লীতে করুণ-কাতরতায় অশ্রুময় অঞ্চলে বিধবার অশ্রু মুছাইতেন। হাসপাতালে ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির দ্বারা বিপন্ন দরিদ্র সহায়হীন রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইবে বলিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী অকাতরে অর্থদান করিতেন, আর সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাসুন্দরী ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র পল্লীর আর্ত্তপীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী নিরাশ্রয়া, পুত্র-শোকাতুরা হতভাগিনী জননীর অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিয়া শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাসুন্দরী কন্যার প্রাণে কাতরকণ্ঠে সুধামাখা মা মা বলিয়া ডাকিয়া

পুত্রশোকাতুরা জননীর প্রাণে শান্তির সুধা ঢালিয়া দিতেন। ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে করুণার অনন্ত ক্ষীরধারা। দারিদ্র্যে দানের পাষাণ-চাপ হইতে পারে! কিন্তু দয়ার মুক্তোচ্ছ্বাসে দারিদ্র্যের সে পাষাণ-চাপ তুচ্ছ তৃণবৎ ভাসিয়া যায়!

সারদাসুন্দরীর রূপ ছিল, গুণ ছিল; অধিকন্তু সুলক্ষণ ছিল। মুর্শিদাবাদের ভাটেরা তাঁহাকে সুরূপা, সর্ব্বগুণান্বিতা ও সর্ব্ব-সুলক্ষণা দেখিয়া, রাণী হরসুন্দরীর নিকট কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কোন আপত্তি হইল না। সেকালে পাত্র পাত্রীর লক্ষণ নির্ণয় এবং কোষ্ঠিচর্চ্চা, সম্বন্ধের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য তালিকাভুক্ত ছিল। বরের অস্বাভাবিক অভিভাবকত্বে, আর অর্থের পৈশাচিক প্রলোভনে লক্ষণের উপেক্ষা হইত না। হায়! আজ কোথায় সে পবিত্র প্রথা।

কুলাঙ্গারদের কুশিক্ষায় তক্ষকশ্বাসে সে পবিত্র প্রথা পুড়িয়া খাক্ হইয়াছে!

রাজরাণী, সারদাসুন্দরীর লক্ষণপ্রাধান্যের পক্ষপাতিনী হইলেও, ইংরেজি-শিক্ষা প্রভা-স্পর্শে বোধ হয়, কুমার কৃষ্ণনাথ সারদা-সুন্দরীকে না দেখিয়া পাত্রীনির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি অনেক-গুলি পাত্রীর মধ্য হইতে সারদাসুন্দরীকে পছন্দ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে সারদা-সুন্দরী রাজবধূ রাজলক্ষ্মী হইলেন। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্ত্তন হইল। নাম হইল,—"স্বর্ণময়ী"। ঠিকই হইল। জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ী সারদা সরস্বতি চির-ভিখারিণী; আর ষড়ৈশ্বর্য্যদায়িনী স্বর্ণময়ী চির লক্ষ্মীরাণী। ভাটাকুলের ভিখারিণী সারদাসুন্দরী,—মুর্শি-দাবাদের রাজরাণী "স্বর্ণময়ী" হইলেন। বিচিত্র কি? লক্ষ্মীবন্তের গৃহে "লক্ষ্মী" নামই শোভা পায়। এও বলি, যদি লক্ষ্মীর নাম

'স্বর্ণময়ী' না হইত, তাহা হইলে কেবল "স্বর্ণ-ময়ীর" নিজ গুণে নিজ নামের সার্থকতা হইত। মহারাণীর দেবত্বে স্বর্ণময়ী নামও দেবত্ব পাইত।

সারদাসুন্দরীর অপার সৌভাগ্য! কোথায় দরিদ্রের পর্ণকুটীর,—আর কোথায় অমরার রত্নসিংহাসন। কোথায় ভিখারিণী,—কোথায় রাজরাণী! দাম্পত্যের চরম সুখ! পরিণয়ের অপার প্রেম-পারাবার! কিন্তু হায়! কৈশো-রের সারদা,—যৌবনের স্বর্ণময়ীর ভাগ্যে এ সুখ বেশী দিন সহিল না! রাজদম্পতী দুইটী অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। অকালে দুইটী কুসুমই শুকাইয়া যায়! সপ্ত-দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সধবার সৌভাগ্য-সঙ্কেত স্বর্ণময়ীর সীঁথার সিন্দুর মুছিয়া গিয়াছিল এবং হাতের কঙ্কণ খসিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। একটী কন্যা রাজা কৃষ্ণনাথের জীবিতাবস্থায় শৈশবে এবং অপর

কন্যা জীবনান্তে কৈশোরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বহরমপুর বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছিল। কন্যা দুইটীর "লক্ষ্মী" ও "সরস্বতী" নাম ছিল।

সোণার কমল ডুবিল! সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা সব ফুরাইল। রাণী স্বর্ণময়ী অকূল পাথারে ভাসিলেন! চারিদিক্ শূন্য দেখিলেন! বিপদের উপর বিপদ। শত্রু জুটিল। আত্মজন বিরূপ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুইখানি উইল দাখিল করিলেন। একখানি উইলের মর্ম্ম এই, রাজা কৃষ্ণনাথ মুরশিদাবাদে নিজ উদ্যানবাটী বানজেঠিয়ায় "কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্বে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীকে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি দিয়াছেন। কন্যা জীবিত ছিল। তাহার বিবাহের জন্য কিছু দেওয়া

হইয়াছিল। আর বিধবা স্বর্ণময়ীকে মাসিক ১৫০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; অপিচ রাণীকে দত্তক গ্রহণে নিষেধ করা হইয়াছিল। আর একখানা উইলে কিন্তু রাণীকে উপর্য্যুপরি ছয়বার দত্তক লইতে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরেও যদি বংশরক্ষা না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃত্বে একটা কলেজ বসাইতে বলা হইয়াছিল। দুই উইলের একজিকিউটার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। রাজার এটর্ণি ষ্ট্রেণ্টেল সাহেবকে একজিকিউটার করা হইয়াছিল।

উইলের ফলে রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইলেন। রাজরাজেশ্বরী কাঙ্গালিনী হইলেন। সহায় নাই,—সম্পত্তি নাই। সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীধন,—তাহাতেও টান দেওয়া হইয়াছিল। এ বিপদে কে রক্ষা করে? এ অকূল সাগরে কে কাণ্ডারী হইবে? বৈধব্যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী যোগিনী রাজরাণী উপায়া-

ন্তর না দেখিয়া, অকূলের কাণ্ডারী বিপদত্তারণ মধুসূদনের পাদপদ্মে মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।

সহসা দিক্ পরিষ্কৃত হইল! ঘোর অন্ধকারে অনাবিল শুভ্র আলোক ফুটিল! মহারাণী সহায় পাইলেন,—কূল পাইলেন,—পথ দেখিলেন,—উপায় পাইলেন! এই সময় ঢাকা ভিল্লীনিবাসী রাজীবলোচন রায় রাজসংসারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজীবলোচন দীর্ঘদর্শী, উৎসাহী, সাহসী উদ্যোগী, সাধু, নিঃস্বার্থ পুরুষ। তিনি বিপন্না স্বর্ণময়ীর সহায় হইলেন এবং তাঁহার বিষয়োদ্ধারের জন্য প্রাণান্ত পণ করিলেন। তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীকে স্থপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারই পরামর্শানুসারে স্থপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হইল। দুর্ভাগ্যের অন্ধকার কাটিয়া সৌভাগ্যের দীপ্ত ভানু প্রকাশিত হইল। মহারাণী আর এক সহায় পাইলেন। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত

এটর্ণি হরচন্দ্র লাহিড়ী রাণী স্বর্ণময়ীর সহায় হইলেন।

সুপ্রিমকোর্টের ফুলবেঞ্চে উইলের বিচার হইল। ১৮৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর বিচারের চূড়ান্ত হইল। রাণীর তরফে থাকিলেন, প্রধান কৌঁসুলি সঙ্গেবিল টেলর ক্লার্ক; সঙ্গে থাকিলেন মর্টন। আর একজিকিউটার ষ্ট্রেটেলের তরফে থাকিলেন কৌঁসুলি কক্রেণ আর মেকফার্সন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে থাকিলেন স্বয়ং এড্ভোকেট জেনেরল, কৌঁসুলি প্রিন্সেপ এবং রীচি। কৌঁসুলি লীথ ছিলেন এডভোকেট জেনেরল। উইলের মামলায় কৃষ্ণচন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তিও সংসৃষ্ট ছিলেন। * তাঁহার পক্ষ

* এই উইলের মোকদ্দমা সম্বন্ধে নবীন নামক এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি বিদ্যাসাগরের সাহায্যে উইলের অনুবাদ করিয়াছিলাম।" বিদ্যাসাগর ১১৮ পৃঃ।

লইয়া ছিলেন কৌঁসুলি ডিকেন্স। বিচারের সময় তিনি উপস্থিত থাকেন নাই, সেণ্ডেস সাহেবই তাঁহার হইয়া হাজির ছিলেন। ফুল বেঞ্চের বিচার, এত বড় বড় কৌঁসুলি ধূমধাম খুবই হইয়াছিল, কিন্তু শেষে বড় জজ রায় দিয়া রাণীর বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিলেন। উইল অগ্রাহ্য হইল। সিদ্ধান্ত হইল, রাজা কৃষ্ণনাথ সজ্ঞানে থাকিয়া, নিজের স্বেচ্ছায় উইল করেন নাই; উইল করিবার তাঁহার শক্তি সামর্থ্যই ছিল না। রাণী স্বর্ণময়ীর জয় হইল, পতিধনে তিনিই অধিকারিণী হইলেন।

"ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলীভবন্তি"—রাণী স্বর্ণময়ী এক বিপদে উদ্ধার হইলেন, আর এক বিপদ্ আসিল। রাজা কৃষ্ণনাথের মাতা রাণী হরসুন্দরী সুপ্রিম কোর্টের সদর আমীন ৺হরচন্দ্র ঘোষের এজলাসে নালিশ করিয়াছিলেন।

নালিশের মর্ম্ম,—রাজা কৃষ্ণনাথ অভক্ষ্য

ভক্ষণ, অপেয় পানাদির জন্যে জাতিধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, পৈতৃক বিষয়ে তাঁহার অধিকারই ছিল না। তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ীরও সুতরাং পতিধনে অধিকার নাই। রাণী স্বর্ণময়ীর হাতে যাহা ছিল, মূল মামলার পূর্ব্বে, তাহাতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য, এইরূপ নালিশ করান হইয়াছিল। ফল হয় নাই। আর সে পুরাতন কষ্টের কথা কহিয়াও লাভ নাই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টেই আর একটা মামলা উপস্থিত করা হইয়াছিল। এ মামলার বাদী হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া। দেখাইতে চাওয়া হইয়াছিল, "রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, আত্মঘাতীর বিষয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য"। প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ছিল, কৃষ্ণনাথের পিতামহী, মাতা ও ভগিনীর ভরণ পোষণের জন্যে। পিতামহীর মৃত্যুর পর ভারত গবর্ণমেণ্ট নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চীফ জষ্টিস

সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, "আত্মঘাতীর বিষয় সম্পত্তি রাজার অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হইবে, এ আইন এদেশে কোন কালে বাহাল হয় নাই। এ আইন এদেশে খাটিতেই পারে না।" এ মামলায়ও রাণী স্বর্ণময়ীকে অনেক কাণ্ড করিয়া জয় লাভ করিতে হইয়াছিল। *

রাণী স্বর্ণময়ী সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি ৺হরচন্দ্র লাহিড়ীকে শাল রুমাল প্রভৃতি দ্রব্য সম্ভার এবং নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় দিন কতক মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহার পর রায় রাজীব-লোচন রায় বাহাদুর দেওয়ান বা মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হন। রায় রাজীবলোচন না থাকিলে, হয় ত রাণী স্বর্ণময়ীকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আজীবন পথে পথে বেড়াইতে হইত। ধন্য রাজীব!

* দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা ১৪ই ভাদ্র ১৩০৪ সাল।

রাণী স্বর্ণময়ী যখন কাশীম বাজারের রাজ-রাজেশ্বরী হইলেন, সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন, তখন রাজা কৃষ্ণনাথের অপব্যয় হেতু অনেক দেনা হইয়াছিল; অধিকন্তু ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানীর অধিকারে দেনা বাড়িয়াছিল, রাণী স্বর্ণময়ী সাহসে বুক বান্ধিয়া, হরিপদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, রাজীবলোচনের পরামর্শ লইয়া, স্বয়ং সকল বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া শাসন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর রাণী স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং জমিদারীর দলিল দাস্তাবেদ সই করিতেন।

রাজরাজেশ্বরী হইয়াও মহারাণী বিধবোচিত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে যোগিনীরূপে জীবন অতি বাহিত করিয়াছিলেন। বিশ্বসেবারতা রাণী স্বর্ণময়ী একাহার করিতেন, কখন ভূমি-শয্যা, কখন কম্বল-শয্যায় শয়ন করিতেন। রাজীবলোচনের প্রখর বুদ্ধিবলে আর স্বর্ণ-

ময়ীর অনন্ত পুণ্যবলে শত্রুকুল অচিরে নির্ম্মূল হইয়াছিল এবং সকল ঋণ পরিশোধিত হইয়াছিল। জমিদারীর আয়ও বাড়িয়া গিয়াছিল। এইবার স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণারূপে মুক্তহস্তা হইলেন। রাজীব সে বিমুক্ত দান দাক্ষিণ্যের সহায় হইলেন। বাল্যকালে স্বর্ণময়ীর যে হৃদয়-প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছিল, বিষয় বিপর্য্যয়েও তাহা রুদ্ধ হয় নাই। উন্মুক্ত প্রাণের উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস!

রাজীবলোচনের বিষয় সম্পত্তি ছিল না। বিষয়-বিভবে তাঁহার লোভ ও প্রবৃত্তি ছিল না। রাজীবলোচন উপযুক্ত রাণীর উপযুক্ত মন্ত্রী। তাঁহার মত সুপরামর্শ দিতে, তাহার মত দানে উৎসাহ দিতে, তাঁহার মত মহারাণীর মান মর্য্যাদার পথ প্রশস্ত করিতে, আর কেহ পারিতেন কি না সন্দেহ। রাজীবলোচনের মত বুদ্ধি বিচক্ষণতা অনেকেরই থাকিতে পারে, যোগ্যতা ও প্রভুভক্তিও অনেকের

থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার মতন বিশাল হৃদয় অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ ইহ-লোক হইতে বিদায় লইয়াছেন বটে; কিন্তু এ ভূতলে তিনি অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, রাজীবলোচন না হইলে, বুঝি স্বর্ণময়ী ফুটিতেন না; স্বর্ণময়ী না হইলে রাজীবও ফুটিতেন না। স্বর্ণময়ী স্বভাবিক দানপরায়ণা বটে; কিন্তু রাজীবলোচনের বুদ্ধি বিবেচনায় না চলিতে পারিলে, কে বলিতে পারে, তাঁহার সকল দান সার্থক হইত? আর রাজীবলোচন যদি স্বর্ণময়ীর মতন দানশীলা কর্ত্রী না পাইতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, তিনি রাণীর সেই অতুল বিষয় সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইতেন; রাজীব-লোচনের সৎপরামর্শে, সদুপদেশে—সৎ-শিক্ষায় স্বর্ণময়ী নিজের হৃদয় বিশাল করিয়া-ছিলেন,—নিজের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর তাবৎ স্বর্ণময়ী, যাবৎ স্বর্ণময়ী, তাবৎ রাজীবলোচন।

রাণী ভবানীকে দেখি নাই; জন্মান্তরে দেখিয়া থাকি ত সে স্মৃতি ত নাই,—শুনিয়াছি তাঁহার নাম,—শুনিয়াছি তাঁহার কীর্ত্তি;—জন্ম-জন্মান্তরে এমনই শুনিব। বড় সৌভাগ্যে মহারাণী স্বর্ণময়ীকে দেখিলাম। আবার জন্মজন্মান্তরে এই নামই শুনিব। যাঁহাকে দেখিলাম,—যাঁহার অপার দয়া দাক্ষিণ্য দানশীলতা অনুভব করিলাম,—তাঁহার কথা, তাঁহার দানের কথা, তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব! বলিবার শক্তি নাই, বলিবার শব্দ নাই, বলিবার ভাষা নাই, বলিবার ব্যাকরণ নাই। প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, কোটি কোটি কণ্ঠ এক হইয়া, বলি, "ধন্য স্বর্ণময়ী! ধন্য তুমি! তোমার তুলনা নাই।"

কেহ কখন হাত পাতিয়া, মহারাণী স্বর্ণ-

ময়ীই কি, আর রায় রাজীবলোচনই কি, কাহারও নিকট হইতে, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। অনেক সময় অনেকে আশাতীত দান পাইয়া স্তম্ভিত হইত। একবার একজন পুলিশের কর্ম্মচারী বড় কষ্টে পড়িয়া মহারাণীর নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন বড় জোর ২০।২৫ টাকা মাত্র পাইবেন। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন, পাঁচ শত টাকা। একবার একজন চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার চক্ষুরোগ আরাম হয়, এমন কিছু করিতে পারেন।" রাজীবলোচন বুঝিলেন, সে চক্ষুরোগ আরাম হইবার নহে; অথচ রোগ আরাম হইবে না, এমন কথা বলিলে, ব্রাহ্মণের কষ্ট হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এখানে চক্ষুরোগ আরোগ্য করিবার ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই। আপনি মাসিক বৃত্তি লউন, সে বৃত্তিতে আপ-

নার সংসার চলিবে ; চিকিৎসাও হইবে।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“আমি বৃত্তি চাহি না।” তখন রাজীবলোচন নিরুপায় হইয়া বলিলেন, “আর উপায় কি ?” তিনি এক থালা চিনি আনিয়া বলিলেন,—“আপনাকে এক থাল চিনি লইতে হইবে। প্রভো ! এ অধমের এ অনুরোধ রক্ষা করুন।” ব্রাহ্মণ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, থালা লইলেন। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন যে, যে থালাতে চিনি ছিল, সে খানি খাঁটি রূপা নির্ম্মিত, মূল্য পাঁচ শত টাকার কম নহে।

এমন কত দৃষ্টান্ত আছে। অসিতগিরি কালি হইলে, সমুদ্র মস্যাধার হইলে, পৃথিবী কাগজ হইলে, সুমেরু লেখনী হইলে আর গণেশ লেখক হইলে এ দানের বর্ণনা হয় না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান শিখ, পারিসিক্ মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট কেহ চাহিয়া কখনও বঞ্চিত হয় নাই।

স্বর্ণময়ী তিলির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ-নন্দিনী রাণী ভবানীর ন্যায় দানে মুক্ত-হস্তা ছিলেন। মনে হয়, রাণী ভবানী বুঝি, অপহৃত আয় কর জমিদারী বাহারবন্দের আয়ের সদ্ব্যয়ে আক্ষেপ মিটাইবার আশায় এ ধরাধামে স্বর্ণময়ী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভিখারিণীকে অন্ন দান, জলকষ্টে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, অগ্নিভয়ে সাহায্য পিতৃমাতৃ ও কন্যাদায়ে অকাতরে অর্থ দান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগকে বার্ষিক প্রদান, সাধারণ ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ বস্ত্র দান প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই রাণী ভবানী, আর করিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। আর কি এমন হইবে? প্রতিদিন মহারাণী সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে মুষ্টি ভিক্ষা দান করিতেন। ইহার উপর হাসপাতাল, হোষ্টেল, বিদ্যালয় প্রভৃতি কার্য্যে আরও দান ছিল। এতদ্ব্যতীত দোল দুর্গোৎসবের ক্রিয়া কলাপের কথা আর বলিতে হইবে না।

মহারাণী ষাট লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন।

দানশৌণ্ডতায় মুগ্ধ হইয়া আমাদের ব্রিটিশ-রাজ ১৮৭১ সালে রাণী স্বর্ণময়ীকে মহারাণী উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করেন, মহারাণীর উত্তরাধিকারীরা মহারাজ হইবেন। ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী কাশীমবাজারের মহারাণীকে 'ক্রাউন্ অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধি দিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীন রাজেশ্বরীরাই এই উপাধির অধিকারী।

বড় সৌভাগ্যে রাজার নিকট এইরূপ সম্মান হয়, কিন্তু মহারাণী জীবনের যে উদ্দেশ্যে, যে পবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঐহিকের এ সম্মান তাহার কাছে নগণ্য। ব্রত উদ্‌যাপিত না হইতেই মহারাণী অন্তর্ধান করেন। ব্রত কি উদ্‌যাপিত হইয়াছিল? তবে কেন এখনও কোটি কোটি

কণ্ঠশ্বাস-প্রাণ নরনারীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই?

রাজীবলোচন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। মহারাণীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার লোকান্তর হয়। রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর শ্যামাদাস রায়, তারিণীপ্রসাদ রায়, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ ঘোষ এবং বীরচন্দ্র সরকার এই ছয় জন মেম্বর লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটি সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরামর্শানুসারে কাশীমবাজার-রাজবাটীর কার্য্য পরিচালনা করিতেন। শ্যামাদাস রাজীবলোচনের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনিই দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। ক্রমে তারিণী রায়ের মৃত্যু হইলে মহারাণীর ভগিনী পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল মহাশয় উক্ত কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে সকল মেম্বর গুলির

মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরামর্শানুসারে ১২৯৯ সালে বিজয়ার দরববারে মহারাণী শ্রীনাথ বাবুকে ম্যানেজার ও রাজবাটীর ইঞ্জিনিয়ার বাবু মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বহুদিন কাশীমবাজার রাজসংসারের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ক্রমে বৈকুণ্ঠ বাবুর সহিত শ্রীনাথের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় বৈকুণ্ঠনাথের সহিত রাজবাটীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। *

রাজা কৃষ্ণনাথের মাতা রাণী হরসুন্দরী কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন; তাহার পর, তাঁহার দৌহিত্র ও রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

মুরশিদাবাদ হিতৈষী লিখিয়াছিলেন,—

* ১৭ই ভাদ্র ১৩০৪ সাল, মুরশিদাবাদ হিতৈষী।

"রাণী হরসুন্দরীর দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্র নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন; স্বার্থপর কু-লোকের জন্য তিনি স্নেহময়ী মাতুলানীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে কলিকাতায় বিতাড়িত হন। আমরা শুনিলাম, মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্ব্বে মহারাণী মহোদয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়া-ছিলেন, তথাপি তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় নাই। তাঁহার বহরমপুরস্থ বন্ধুগণের তার-সংবাদে তিনি বুধবার রাত্রিতে বহরমপুরে উপস্থিত হন। মহারাণীর মহোদয়ার মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারিনী রাণী হরসুন্দরী উপস্থিত না থাকায়, কাশীমবাজার ও সৈদা-বাদ রাজবাটীতে চাবী বন্ধ হইয়াছে। সৈদা-বাদ রাজবাটী স্ত্রী-ধনের বলিয়া কোন পক্ষ হইতে আপত্তি হওয়ায় কালেক্টর বাহাদুর তাহা 'পরে বিবেচিত হইবে' বলিয়া উত্তর প্রদান করেন। যাঁহারা সে বাটীতে ছিলেন,

তাঁহাদিগকে সে বাটী এক্ষণে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশীমবাজার রাজাসনে উপবিষ্ঠ হইবেন।" *

কেহ কেহ মহারাণীর স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ যুগে এ প্রস্তাব অনুপযোগী নহে; কিন্তু মহা প্রলয়েও যাঁহার কীর্ত্তির লোপ নাই, তাঁহার আবার কি স্মৃতিচিহ্ন হইবে? যাঁহার মূর্ত্তি আপ্রলয় পৃথিবীমাঝে হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে, তাঁহার আবার কি স্মৃতিচিহ্ন রাখিবে? স্মৃতি-চিহ্ন কিছু মাত্র থাকে রাখ; কিন্তু আমরা বলি, এখন একবার সকলে মিলিয়া উচ্চে গগনপ্রাঙ্গণে চাহিয়া বলো,—"জ্যোতির্ম্ময়ি!

* মহারাণীর লোকান্তর হইলে পর মুরশিদাবাদ হিতৈষিণী এই কথা লিখিয়াছিলেন। এখন মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশীমবাজারের রাজাসনে উপবিষ্ট মনীন্দ্রচন্দ্র বহু পুণ্যফলে আজ অতুল ধনে অধিকারী তিনি যশস্বী হইয়া রাজবংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

তুমি যে লোকেই থাক, সেই লোকের জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন হইতে এ মর্ত্তের নরনারীকে তোমার মতন বিশ্ব-সেবা ব্রত শিখাইয়া দাও।"

সম্পূর্ণ।

বিজয়া বটিকা।

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ।

রাজ্যেশ্বর রাজা

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্ত্রীলোক এবং বালক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

* * *

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা

ইহার সবিশেষ পক্ষপাতিনী।

বিজয়া বটিকার

প্রসিদ্ধি

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল!

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত; যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত

একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই গুণপণা,—এই খানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত-মুখ-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে;—এমন বিবিধব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে

আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা-যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ববৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্যবৃদ্ধি হইবে! সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক-শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে?

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চির-পরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রামে ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

বিজয়া বটিকা

কোন্ কোন্ রোগে বিশেষ কার্য্যকরী?

(১) মাথাধরা; (২) অক্ষুধা; (৩) গা-হাত-পা কামড়ানি; (৪) বৈকালে চক্ষুজ্বালা; (৫) মাথাঘোরা; (৬) সর্দ্দিকাসি; (৭) গা

ভার-ভার ; (৮) ধাতুদৌর্ব্বল্য ; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার ; (১০) লাবণ্যহীনতা ; (১১) দুঃস্বপ্নাদি ; (১২) পিঠে কোমরে বেদনা ; (১৩) বুক-ভার ; (১৪) আবিল্য।

মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৶০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	৶০

বিশেষবৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	৶০

বিজয়া বটিকার

পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা ; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং